প্রতিধ্বনি the Echo
An Online Journal of Humanities & Social Science
Published by: Dept. of Bengali
Karimganj College, Karimganj, Assam, India.
Website: www.thecho.in

অশ্বচরিত : প্রবহমান সময়ের কাহিনি

' Amar Mitrer 'Aswacharita': Probohoman somoyer Kahini (

Rupdatta Roy
Asst. Professor, N.C College, Badarpur, Assam, India

Abstract

For last three decades in the last century modernist sensibility were changing rapidly as the Indian life was opening up to the post modernist tendencies. As a result, Bengali novels were undergoing metamorphic changes. Bengali novelists started to look beyond the established example of novels. Amar Mitra, one of the tactful narrators of this tim reconstructed history and tradition in his novels. He introduced the magic present inside the reality and the new dimension of myth from the womb of historical part. In the novel 'Aswacharita' (1979) the rhythm of time and space is entirely distorted when adherence of empty back horse and the charioteer after the great departure of Siddartha, the prime of Kapilabastu, is connected with the nuclear bombing in Pakistan on the day of Buddha Purnima and this creates a diverse implication of multidimensional time.

উপন্যাসের বিষয় ও শৈলী নিয়ে নানা সময়ে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়েছে। বিশেষতঃ, বিশ শতকের শেষ তিন দশক থেকে এই প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। কারণ বলাবাহুল্য যে, সময় যখন চূড়ান্ত অস্থির তখন স্বাভাবিকভাবেই সেই অস্থির সময়কে আত্মস্থ করতে গিয়ে ঔপন্যাসিকদের গ্রহণ করতে হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন পথ ও পাথেয়। তাই পূর্ব-নির্ধারিত উপন্যাসের সংজ্ঞা আজ আর যথাযথ থাকছে না। তবে একটি যথার্থ উপন্যাসের ক্ষেত্রে যে বিষয়টি অপরিবর্তনীয়, তা আজকের বিশিষ্ট তাত্ত্বিক তপোধীর ভট্টাচার্যের ভাষায় বলা যায় ---------

> "……এ সম্পর্কে সম্ভবত দ্বিমত নাই যে প্রতিপাদ্য বিষয় ও প্রকরণ জুড়ে থাকবে সমকালীন সমাজের বয়ান। এই বয়ানে আলো পড়বে চারদিক থেকে। তবু বর্তমান নিছক বর্তমান থাকবে না উপন্যাসে, হয়ে উঠবে ভবিষৎ অতীতের সন্দর্ভ। ঘটনা হবে এমন যাকে সময়ের চিহ্নায়ক বলে আমরা অনায়াসে বুঝে নিতে পারব।"
>
> (পৃঃ ১৩২-১৩৩/আখ্যানের স্বরান্তর)

২০০১ সালের বঙ্কিম পুরস্কারজয়ী অমর মিত্রের 'অশ্বচরিত' (১৯৯৯) নামক উপন্যাসটি সমালোচক কথিত এই বাক্যগুলি যথার্থ নিদর্শন। খণ্ডসময়ের সামাজিক বয়ান থেকে উঠে আসা চিহ্নায়কগুলি যেমন আখ্যানে স্থান খুঁজে নেয়, তেমনি যে সময় অতীত বর্তমান ছুঁইয়ে ভবিষৎ পর্যন্ত বিস্তৃত সেই মহাসময়ের সুরটিও আখ্যানটি আত্মস্থ করে। বুধপূর্ণিমার রাতে হারিয়ে যাওয়া এক হোটেলওয়ালার ঘোড়ার অনুসন্ধানের সূত্রে উঠে আসে বিভিন্ন মানুষের জীবন কথা, আসে বর্তমান থেকে ইতিহাস হয়ে প্রাগৈতিহাসিক সময়ের কথা, বাদ যায় না ভবিষৎও। প্রত্নকথা, আদিকল্প, কিংবদন্তী, ধ্রুপদী সাহিত্য, কল্পনা,

প্রতীক সব গ্রথিত হয়ে যায় উপন্যাসটির কোষে কোষে। উপন্যাসটির প্রচ্ছদপটে আভাস দেওয়া হয় খণ্ডসময় ও মহাসময়ের এই দ্বিরালাপ সম্বন্ধে ----

> ''কপিলাবস্তুর রাজপুত্রের মহানিষ্ক্রমণের পর শূন্যপৃষ্ঠ ঘোড়া কন্থক আর শূন্য হৃদয় সারথী ছন্দক পাশাপাশি বেঁচেছিল এতকাল। বুদ্ধপূর্ণিমার রাতে ঘোড়াটি নিরুদ্দেশে গেল সারথীকে ফেলে। সারথী সেই ঘোড়াকে খুঁজতে খুঁজতে চলে যায় কিংবদন্তীর জাহাজঘাটা থেকে রকেট উৎক্ষেপন কেন্দ্রে, সেখান থেকে সুবর্ণরেখা আর বঙ্গোপসাগরের মিলনস্থলে জেগে ওঠা চরভূমিতে, যেখানে পলাতক ঘোড়ারা যায় স্বপ্নতাড়িত হয়ে। শূন্যপৃষ্ঠ সেই অশ্ব যেন অশ্বমেধের ঘোড়া, তাকে অনুসরণ করছে নিঃশব্দ হত্যাকারী, নিশ্চুপে। নিরুদ্দিষ্ট সেই ঘোড়া অতিক্রম করে ভারতবর্ষ, তেজস্ক্রিয় বাতাসে ঢাকা মরুপ্রান্তর, নদীতীর অরণ্য, পাহাড়। 'অশ্বচরিত' সেই বিরল গোত্রের ধ্রুপদী উপন্যাস যার চালচিত্র সমকালীন এই ভারতবর্ষ। এই উপন্যাস জীবন এবং মৃত্যুর। প্রেমের এবং অপ্রেমের। অমর মিত্র তাঁর উপন্যাসে সমকালের কথা বলেন, চিরকালের কথা বলেন। এই উপন্যাসে বিপন্ন এই উপমহাদেশ তার ছায়া ফেলেছে দীর্ঘ।''
>
> (অশ্বচরিত/প্রচ্ছদপট)

তিনশ বিয়াল্লিশ পৃষ্ঠার এই বিশালকার উপন্যাসটির বীজ ১৯৮২ সালে লিখিত আরেকটি উপন্যাসে রয়ে গেছে। 'শিলাদিত্য' পত্রিকায় 'বিভ্রম' নামে একটি উপন্যাসে প্রকাশিত হয়েছিল, যার বিষয়বস্তু ছিল সমুদ্রতীর আর একটি নিরুদ্দিষ্ট ঘোড়া। একটি সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন যে কর্মসূত্রে দীর্ঘ প্রায় একবছর ১৯৮০ সালে তাঁকে থাকতে হয়। সেই সময় সে হোটেলে তিনি ছিলেন সেই হোটেলওয়ালার ঘোড়া হারিয়ে যায়। ভানুদাস নামের একটি লোক সেই ঘোড়ার খোঁজ করে বেড়াচ্ছিল, লেখক নিজেও মাঝে মাঝে তার সঙ্গে বেরিয়ে পড়তেন। কিন্তু 'বিভ্রম'কে নিয়ে আখ্যানকারের একটু দ্বিধা ছিল তাই দীর্ঘদিন উপন্যাসটি দুই মলাটের ভিতর প্রকাশের অপেক্ষায় রয়ে যায়। হয়তো এভাবেই রয়ে যেত। কিন্তু ১৯৯৮ সালে ঘটে যায় একটা বড়ো ঘটনা। ঘটনাটি ছিল বুদ্ধপূর্ণিমার রাতে পোখরানে পরমাণু বোমার সফল পরীক্ষা এবং সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে দক্ষিণপন্থী গোঁড়া জাতীয়তাবাদ উস্‌কে দেওয়ার চেষ্টা, ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক গোষ্টীর সম্পূর্ণ নিজেদের স্বার্থে। লেখককে এ ঘটনা নাড়া দিয়েছিল প্রচণ্ড। এই ঘটনা 'বিভ্রম'কে কীভাবে 'অশ্বচরিত'-এ পরিণত করল তা জানিয়ে লেখক এভাবে -----

> ''বিভ্রম' নিয়ে আমি নিজেই বিভ্রমে ছিলাম তাই এটিকে দুই মলাটে আনতে পারিনি। ...আমি মাঝে মধ্যে ছাপা অংশটি নেড়েচেড়ে দেখতাম। কীভাবে লেখাটি সম্পূর্ণ করে তোলা যায়। ১৯৯৮-এ পরমাণু বিস্ফোরণ হয়। ভারত এবং পাকিস্তান দুই দেশের রাষ্ট্রনায়করা খেলনার মতো পাঁচটি আর সাতটি পরমাণু বোমা ফাটিয়ে নিজেদের জাহির করলেন। যেন এ পাড়ার মাস্তান পাঁচটি বোমা ফেলল। মাসল্ দেখাল, ও পাড়ার তা দেখে সাতটি বোমা ফাটিয়ে মাস্‌ল দেখাল। 'অশ্বচরিত' লেখা শুরু করি সেই মে-মাসে।''(পৃঃ ৩৩৫/অমৃতলোক/মার্চ ২০০৩)

আঠারো বছর আগের সেই পলাতক ঘোড়ার সঙ্গে মিশে গেল সমসাময়িক ঘটনা, আর তাকে লেখক উপস্থাপিত করলেন মহাসময়ের কাঠামোতে। সেই সময় 'ধ্রুবপুত্র' লেখার জন্যে সংস্কৃত সাহিত্যের অধ্যয়ন করেছিলেন কথাকার। অশ্ব ঘোষের 'বুদ্ধচরিত' থেকে রাজকুমার গৌতমের ঘোড়া কন্থক আর সারথী ছন্দক চলে এল আখ্যানে। বাস্তব ও পরাবাস্তব মিশে গিয়ে সময় ও পরিসরের সীমানা, ভূগোল ও ইতিহাসের কাঁটাতারের বেড়া ভেঙে দিল। বাস্তবের নির্দিষ্ট পরিসর ভেঙে দিল ইন্দ্রজাল -----

"ছিল পক্ষিরাজ, হয়ে গেল কন্থক। ছিল ভানুচরণ, ভানুদাস হয়ে গেল ছন্দক।" (পৃঃ ১/অশ্বচরিত)

ঔপনাসিক কেবলমাত্র যথাপ্রাপ্ত সময়ের লিপিকার নন। তাঁর কাজ যেভাবে সাধারণ মানুষের সামনে প্রতীয়মান হচ্ছে তাকে লিপিবদ্ধ করাও নয়। ঔপন্যাসিক আমাদের দেখিয়ে দেন সময় ও সমাজের এই দিকটা, যা আমরা দেখিনি বা দেখলেও সেই দেখায় রয়েছে একদেশদর্শিতার ভুল। যেহেতু, অনেক ক্ষেত্রেই প্রতাপ, বিশ্বপুঁজিবাদ নিজেদের সুবিধার্থে ছদ্মসত্য তৈরী করে, ফলে অনেকক্ষেত্রেই সেই ছদ্মমায়ায় ভুলে থাকার সম্ভাবনারয়ে যায়। দ্রষ্টাচক্ষু সম্পন্ন সৎ ঔপন্যাসিকের কাজ সময়ের মধ্যে থাকা ইতি ও নেতি পাঠকের সামনে তুলে ধরা। মুখ থেকে বিজ্ঞাপনের মুখোশ খুলে দেওয়া। অমর মিত্র একজন যথার্থ ঔপন্যাসিক হিসেবে তাই করেন। জীবন যে বহু বিপ্রতীপের আশ্চর্য সমাহার তা জানান তিনি তাঁর পাঠকদের। হোটেলওয়ালা শ্রীপতি মাইতির নিরুদ্দিষ্ট ঘোড়ার অনুসন্ধানের প্রয়াসে আবিষ্কৃত হতে থাকে জীবনের নানা দিক, উদ্‌ঘাটিত হতে থাকে সময়ের নানা বিভঙ্গ।

বন্ধ হয়ে যাওয়া পাটকলের শ্রমিক ঘোড়াটির তত্ত্বাবধায়ক ভানুদাস ঘোড়াটির খোঁজে ঘুরতে থাকে নানা জায়গা, সেই জায়গার মানুষগুলো উঠে আসে আখ্যানে এই অনুসন্ধানের সূত্রে উঠে আসে নানা তথ্য। ভানুদাস যে ছিল নিতান্তই এক জুটমিলের শ্রমিক, সে নানা মানুষের জীবন দেখতে দেখতে আর সেই তথ্যগুলোকে জুড়তে জুড়তে যেন হয়ে ওঠে দার্শনিক। সে নিজেকে বলে ছন্দক আর শ্রীপতি মাইতির ঘোড়াটিকে বলে কন্থক। তার কল্পনার সূত্রে আখ্যানে গ্রথিত হয় সেই মহামানবের কথা যিনি আড়াই হাজার বছর আগে সর্ব মানবের চির শান্তি, চির আনন্দের পথ সন্ধান করার উদ্দেশ্যে ত্যাগ করেছিলেন পরিবার পরিজন, সিংহাসন রাজ্য। 'অশ্বচরিত' শুরু হয়েছে 'বুদ্ধচরিত'-এর অষ্টমসর্গের চতুর্দশ শ্লোক দিয়ে। কুমার ফিরে এসেছেন ভেবে সন নারীরা জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে শূন্যপৃষ্ঠ ঘোড়াকে ফিরে আসতে দেখে জানালা বন্ধ করে বিলাপ করতে লাগল। এই অর্থ সম্বলিত শ্লোকটি 'অশ্বচরিত' —এর প্রারম্ভে ব্যবহৃত হলেও, তা আখ্যানভাগ থেকে আলাদাই রয়ে যেত যদি না ভানুদাসের মাধ্যমে তা তৎকালীন সময়োপযোগীভাবে ব্যবহৃত হত। লেখক বিষয়টিকে বিস্তৃত করে জানান -----

"ভানুচরণ নিজের পরিচয় দেয় ছন্দক বলে। বলে বেড়ায় হারানো ঘোড়াটি কন্থক। ... উপন্যাসে সে একটি বন্ধ কারখানার শ্রমিক। ... আসলে ভানুদাসের স্মৃতি এই সভ্যতার স্মৃতি। তার বয়স আড়াই হাজার বছর। সে যেন বৃদ্ধ প্রপিতামহ। আরও পূর্বপুরুষের কেউ। এ উপন্যাসে প্রাচীন ভারত এসেছে ভানুদাসের স্মৃতিতে।"

(ছন্দক আর কন্থকের কথা/সুন্দর বৈশাখ ১৪০৭)

কিন্তু এ আখ্যান কেবল স্মৃতির আখ্যান হয়েও থাকে না, মহাসময়ের স্রোতে খণ্ডসময়ের উপলখণ্ডটিকে ধৌত করে। বুদ্ধের প্রসঙ্গ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে যখন পরমাণু বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটানো হয় বুদ্ধপূর্ণিমার রাতে। আর রাষ্ট্রপ্রভুরা পরমাণু প্রকল্পের সাফল্যকে চিহ্নিত করে Buddha Smiles বলে। যে মহামানব মৃত্যুর অন্ত খুঁজতে চেয়েছিলেন, তাঁর জন্ম ও নির্বাণ লাভের দিন এবং তাঁর নাম ব্যবহৃত হয় মারণ যজ্ঞের পরীক্ষণের দিন ও নাম হিসেবে। পক্ষীরাজ কন্থকও পালায় সেদিন। ভানু তার দীর্ঘ মানস ও ভৌগোলিক যাত্রার অভিজ্ঞতা থেকে বলে যায় ----

"বলতে বলতে আচমকা থামে, থেমে যেতে তার কণ্ঠ হতে জেগে ওঠে অন্য এক স্বর। আসলে কন্থক তো জানতো মৃত্যুকে জয় করতে বেরিয়েছেন কুমার, রাজপুত্র মৃত্যুকে নিঃশেষ করতে তাঁর অশ্বটিকে শূন্যপৃষ্ঠ করে রেখে গিয়েছিলেন, এখন মরণের ছায়া দেখে সে কি

কুমারের সন্ধানে গেল, তা না হলে কোথায়, এ মরণে কি কুমারেরও নিস্তার নেই?"

(পৃঃ ২০৯/অশ্বচরিত)

সত্যিই তো কুমারেরও নিস্তার নেই, তাই তো তাঁর নাম এভাবে ব্যবহৃত হয় দক্ষিণপন্থী ক্ষমতাসীন প্রভুদের হাতে। ছড়িয়ে পড়তে থাকে যুদ্ধের বাতাবরণ। ছড়িয়ে দেওয়া হয় সাম্প্রদায়িক বিষ।

ভারতবর্ষে গণতন্ত্র স্থাপিত হয়েছিল এক কল্যাণকামী রাষ্ট্র নির্মাণের লক্ষ্যে। স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কিছুদিনের মধ্যেই এক ক্রান্তদর্শী কবি লিখেছিলেন---

"কিন্তু সেই শুভ রাষ্ট্র ঢের দূরে আজ।
চারিদিকে বিকলাঙ্গ অন্ধ ভিড়---অলীক প্রয়ান।
মন্বন্তর শেষ হলে পুনরায় নব মন্বন্তর;
যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে নতুন যুদ্ধের নান্দীরোল;
মানুষের লালসার শেষ নেই;"

(এই সব দিনরাত্রি/জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা / পৃঃ ১১০)

অনেক বছর পেরিয়ে গিয়েও এই অবস্থার খুব পরিবর্তন হয়নি। দারিদ্র্য, বেকারত্ব, অশিক্ষা, শিশুমৃত্যু, শিশুশ্রম কোনোটিই এখন পর্যন্ত দেশ থেকে সম্পূর্ণ দূরীকরণ সম্ভব হয়নি। লঙ্কায় গেলে যেমন সবাই রাবণ হয়ে যায়, তেমনি যেন যেই ক্ষমতায় বসছে সেই নিজের আখের গোছাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। দেশের আপামর জনসাধারণের কথা ভাবার সময় তাদের কোথায়। যখন সাধারণ মানুষ নিজেদের সমস্যা নিয়ে সোচ্চার হয়ে প্রতিবাদ করে তখনই কোনো না কোনোভাবে সেই সুস্থ আন্দোলনকে প্রতিহত করার চেষ্টা করা হয়। হিটলার বলেছিলেন,

"Vehemence, passion, fanaticism, these are great magnitude forces which along attract the great masses."

(তুলি থেকে বেয়নেট/পৃঃ ৪৭)

প্রতাপ সেই প্রচণ্ডতা, আবেগ আর ধর্মীয় উন্মাদনাকে কাজে লাগায় মানুষের বোধকে দমিয়ে রাখার জন্যে। তাই কখনো সীমান্তে বেধে যাওয়া যুদ্ধ, কখনো পরমাণু বোমার পরীক্ষা আবার কখনো ভিন্ন ধর্মাবলম্বী দুই পক্ষকে সাম্প্রদায়িকতার সুড়সুড়ি দিয়ে ক্ষেপিয়ে তোলে মানুষের দৃষ্টি জীবন সমস্যার থেকে অন্যদিকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। জাতীয়তাবাদের স্লোগান তোলে কী হতে পারে তাও তো আমাদের হাতে কলমে পরীক্ষা করে দেখিয়ে গেছেন হিটলার-মুসোলিনীর মতো ফ্যাসিস্টরা। তবু আমরা ভুলি, ফাঁদে পা দিই, কারণ ---

"Men are not wise when they hear the call of Nationalism." (তদেব/পৃঃ ৭৬)

আর একথা তো জানাই যে দুর্বলতম জায়গাকেই প্রতিপক্ষ নিজের সুবিধা অনুযায়ী ব্যবহার করে। একদিকে জীবন যাপনের অহেতুক কুহকী আমাদের আয়োজন, অন্যদিকে শোষণ দেখে বিশিষ্ট ফরাসি তাত্ত্বিক জাঁ বদ্রিলার তাঁর "Call Memories" — এ লিখেছেন ----

"Anyway we are condemned to social coma, political come, and historical coma. We are condemned to an anaesthetized disappearance, to a fading away under anaesthesia." (Cool Memories / Page — 6)

এই উচ্চারণ নব্বই-এর দশকের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যথাযথ। ইতিহাস : বিছানায় মৃতপ্রায় মুগ্ধা অন্তঃসত্তার মতন' (পৃঃ ৭৬৪ / আকাশ রাত / কাব্যসংগ্রহ)। আর ভোটবাক্স কায়েম রাখার জন্যে চলছে নানা রাজনৈতিক খেলা। একদিকে দেশীয় সংস্কৃতির দ্বজা বহন করার নামে হচ্ছে স্বদেশি জাগরণ মঞ্চ আর অন্যদিকে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রগুলির বেসরকারিকরণ আর বিদেশি লগ্নিকারীদের ডেকে এনে পুঁজিবাদ ও নয়া উপনিবেশবাদের জন্যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করা চলছে। আবার পুঁজিবাদ ও সামন্ততন্ত্রের বিচিত্র সহাবস্থানকে আয়ুধ হিসেবে ব্যবহার করে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে ধর্মান্ধতা, মৌলবাদের বিষ।

তাই কখনো কারগিল, কখনো 'বুদ্ধের হাসি' আড়াল করে অশিক্ষা, অপুষ্টি, দারিদ্র্য, বেকারত্ব। সমস্যা আরো সঙ্গীন হয়ে যখন এ সবের উপর

চাপানো হয় সাম্প্রদায়িক রঙ। যখন তৈরি হয় সহজ সমীকরণ পরমাণু বোমা পরীক্ষা = প্রতিবেশি (মুসলিম) দেশের বিরুদ্ধে শক্তি সঞ্চয় = দেশপ্রেম = হিন্দুত্বের পুনরুত্থান = মুসলমান বিরোধিতা। এ সবের বিরুদ্ধে সচেতন বুদ্ধিজীবী হিসেবে অমর মিত্রের সাহিত্যিক প্রতিবাদ 'অশ্বচরিত'। তিনি জানান -----

> "যে দম্ভ প্রকাশ পেয়েছিল তখন, তার বিপরীতে যে দম্ভ দেখিয়েছে প্রতিবেশী দেশের শাসককুল, তাতে দুই দেশের সাধারণ মানুষ শঙ্কিত, ভীত। তারপর তো দীর্ঘস্থায়ী এক দাঙ্গায় এসে তার চেহারা আরো ভয়ানক হয়ে উঠল। দাঙ্গা নয়, এক সম্প্রদায়ের প্রতি সংখ্যাগুরুর ভীষণ হিংস্রতা প্রদর্শন। ফ্যাসিবাদ ক্রমশ ছেয়ে ফেলেছে আমার এই বাসভূমিকে। তার বিরুদ্ধেই তো কথা বলেছে 'অশ্বচরিত'।" (পৃঃ ৪২১ / অমৃতলোক / বিশেষ সংখ্যা ২০০৩ (৯৭))

এভাবে আখ্যানটিতে ছায়া ফেলে রাজনৈতিক সময়। আর তাই সমালোচক শুভময় মণ্ডল যখন 'অমর মিত্রের গদ্য ও গদ্যের দায়' প্রবন্ধে 'অশ্বচরিত' —কে রাজনৈতিক উপন্যাস হিসেবে আখ্যায়িত করেন, তখন আমরা তা স্বীকার করে নিই। আমরা জানি প্রতিটি অনেকার্থদ্যোতক উপন্যাসেই রাজনৈতিক সময় কমবেশি তার ছাপ ফেলে। কিন্তু 'অশ্বচরিত' —এ রাজনৈতিক সময় কেবলমাত্র তার ছায়া ফেলেছে বললেই বোধ হয় বলা সম্পূর্ণ হয়না। এ আখ্যানের মাধ্যমে অমর মিত্র সভ্যতার পক্ষে থাকা রাজনীতির হয়ে সভ্যতার বিপক্ষে থাকা রাজনীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে নেমে পড়েন।

কন্থকের খোঁজে চলতে চলতে ভানু ওরফে ছন্দক দেখে সাময়িক প্রয়োজনে অধিগ্রহণ করেছে সরকার মহাপাত্রপুর, দেপাল, কুসমাড়—এর জমি। কিছু মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে, জমি হারিয়েছে এমনকি প্রতিবাদ করার ফলে ইজ্জত হারিয়েছে। সুভদ্রা তেমনি একটি মানুষ, যে ভিটা, সংসার ইজ্জত হারিয়ে ক্ষণিকের আশ্রয় পেয়েছে শ্রীপতি মাইতি খামারে নায়েব রামচন্দ্রের সহমর্মিতায়। ভানু ও রামচন্দ্রের সঙ্গে তার কথোপকথন হয়ে ওঠে গভীর রাজনৈতিক চেতনায় নিষ্নাত ----

> "মোদের সব গেল, মোরা তো ভারতের লক।
> তা তো বটে। ভানু সমর্থন করে।
> ভারতের লক, তবু মোদের ধান, পান, সব লিয়ে মোদের উচ্ছেদ করিছিলা।
> ভানু বলল, ইরকম হয়।
> কী হয়?
> মানুষের জমি নেয় গরমেন।
> কেনে নেয়? সুভদ্রা আচমকা চিৎকার করে ওঠে, কেনে নেয় কহ দেখি ভানুবাবু, আকাশ-পুড়ানোয় মোদের কী লাভ?

ভানু আত্মরক্ষা করতে পারে না। সত্যি কেন নেয় সরকার? কী হয় এতে নিজে যেন সরকারের পক্ষে কথা বলছিল। পক্ষে তো কথা আছে। ওই রকেট করে সরকার বোমা পাঠাবে শত্রুর দেশে। শত্রুর দেশ কোনটা? পাকিস্তান হবে। চীন হবে। ভারত ছাড়া সবই ভারতের শত্রু। তার মানে ভারতের লোক ছাড়া সবাই ভারতের লোকের শত্রু। তাই বা কী করে হয়? ভারতের লোকের ভিতরেই কত শত্রুতা, কত শয়তানি! এই যে বসে আছে সুভদ্রা, একে নষ্ট করেছে কে? ধ্বংস করেছে কে? ঠিকাদারের লোক। সে কি অন্য দেশের লোক?" (পৃঃ ১১৯ / অশ্বচরিত)

অত্যন্ত সচেতনভাবে কথাকার সেই সাধারণ সমীকরণটিকে যেন ভাঙতে চাইছেন যেখানে দেশপ্রেম থেকে পৌঁছে যায় সাম্প্রদায়িক বিরোধিতায় বা সামরিক শক্তিবৃদ্ধি মানে দেশ সমৃদ্ধ হওয়ার সহজ অঙ্ক কষা হয়। আর যে রাজনৈতিক চক্রান্ত এমন ভাবতে সাধারণ মানুষকে প্ররোচিত করে তার বিরুদ্ধে তিনি দাঁড়ান, তাঁর শাণিত লেখনী নিয়ে।

সত্তর-পরবর্তী লেখকেরা আখ্যানে কাহিনির বাঁধাধরা ছাঁচে নিজেদের রুদ্ধ রাখেন না যেমন, তেমনি একমাত্রিক আখ্যানও তাঁদের অন্বিষ্ট নয়। অমর মিত্র তার ব্যতিক্রম নন। 'অশ্বচরিত' উপন্যাসটিকে কেবল

মাত্র 'রাজনৈতিক উপন্যাস' হিসেবে দেখলে আখ্যানটির অন্যান্য মাত্রা আমাদের নজর এড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়ে যায়। যেভাবে নানা মানুষের জীবনচরিত অমর মিত্র এই আখ্যানে এনেছেন, তাদের সঙ্গেও তো জড়িয়ে আছে নানা জীবনসমস্যা। সমাজের বাস্তব মুখ ও মুখোশ আর সব মিলিয়ে সমকালীন ভারতবর্ষ। ভানু তার যাত্রা পথে ছুঁইয়ে ছুঁইয়ে গেছে কত অসংখ্য মানুষকে, তাদের ছোট বড়ো কাহিনি এসেছে আখ্যানে, আবার তারা হারিয়ে গেছে। শ্রীপতি মাইতি, ভারতী চৌধুরী, মধুমিতা মাইতি, কুন্তি, অনন্ত নুনমারা, সরস্বতী, পঞ্চম ঠাকুর, প্রেম মদনানি, কোকিলা, গৌরমোহন, শিবরাম ঊষা, ফ্রেদরিক, পরী, বেঙ্গা, রামচন্দ্র, সুভদ্রা, পাণ্ডবকুমার, নগেন গিরি, সতীশ গিরি, সুরেন কুণ্ডু, বিষ্ণুপদ পাতর --- কত মানুষ আর তাদের কাহিনি, আর এই কাহিনিগুলোর মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে রাষ্ট্রীয় প্রতাপের চেহারা, অর্থের অসম বন্টনের কুফল, পুরুষতন্ত্রের বিপ্রতীপে প্রান্তিকায়িত নারীর অবস্থান। আর্থ-রাজনৈতিক ও সামাজিক বাস্তবতা কীভাবে ব্যক্তি-পরিসরকে দুমড়ে মুচড়ে দেয় তা এই জীবনগুলি অধ্যয়ন করলে আমাদের কাছে খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

গণতন্ত্রের সাফল্যের একটি শর্ত হল বিচারব্যবস্থা, শাসন বিভাগ আর প্রণয়নকারী পরিষদ একে অপরের কাজে হস্তক্ষেপ না করে পরস্পরের সহযোগিতায় স্ব স্ব কার্য সম্পন্ন করবে। কিন্তু ভারতবর্ষের জনগণের দুর্ভাগ্য হল, এই দেশ পৃথিবীর সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও গণতন্ত্রের সফলতার প্রাথমিক শর্তের অনেকগুলি এখানে যথাযথভাবে পালিত হয়না। ক্ষমতাসীন দলের অঙ্গুলি নির্দেশে পুলিশ কাজ করে, কখনো বা অর্থবান ব্যক্তিদের নির্দেশে। আবার পুলিশের কুকর্মের সাজা ৯৯.৯৯ শতাংশ ক্ষেত্রেই হয়না। ফলে সাধারণ লোকের পক্ষে পুলিশ বিভীষিকা হয়ে দাঁড়ায় প্রায় ক্ষেত্রেই। সরকারি জমি অধিগ্রহণের সময় পুলিশি অত্যাচার কী ভয়ানক হতে পারে তা আমরা কিছুদিন আগেই প্রত্যক্ষ করেছি লালগড়ে। 'অশ্বচরিত'-এ ওড়িষ্যার বালিয়াপাল ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ কেন্দ্র গড়ে তোলার জন্যে জমি অধিগ্রহণের এক নৃশংস চিত্র ফুটিয়ে তোলেছেন অমর মিত্র দেপাল গ্রামের কাহিনির মাধ্যমে, সুভদ্রার কাহিনির মাধ্যমে।

পঁয়ত্রিশ বছর আগে মহাপাত্রপুর, দেপাল, কুসমাড়-এর জমি সরকারি প্রয়োজনে অধিগ্রহণের নোটিশ দেওয়া হয়। কিন্তু তখন সেসব জমির খানিকটা নিয়ে বাকিটা ভবিষ্যতে নেওয়ার অপেক্ষায় রয়ে যায়। দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে সেখানকার বাসীন্দারা ভেবেছিল সরকার নেবে না জমি, কোনো কারণে পূর্বের সিদ্ধান্ত বাতিল হয়েছে। কিন্তু পঁয়ত্রিশ বছর পরে আবার নোটিশ পড়ল। যারা জমির ক্ষতিপূরণ আগে নেয়নি, তারা নিতে পারে তাও জানিয়ে দেওয়া হল। অথচ পঁয়ত্রিশ বছর আগে যে জমি বালিয়াড়ি, অনাবাদী জমি ছিল, তা কৃষিজমিতে পরিণত হয়েছে। এককালের কেয়াবন আর বন্যগুল্মে ভর্তি জমিতে লাগানো হয়েছে ধান, পান, তরমুজ, চিনেবাদাম, নারকেল গাছ। তারা বেশ কয়েকবার সরকারি সেই খাস জমি লিজ নেওয়ার জন্যেও আবেদন করে, কিন্তু তা নামমঞ্জুর হয়। রেভিনিউ অফিসার বলে, তাদের উচ্ছেদ যখন করা হচ্ছে না তখন লিজ নেওয়ার প্রয়োজন কী? কিন্তু যখন উচ্ছেদের নোটিশ এল, তখন আর সময় ছিল না। দেপালের লোক নিজেদের পরিশ্রমের ফসল, মাথা গোঁজার ঠাঁই বাঁচানোর জন্য সার্ভেয়ার দলকে তাদের কাজে বাধা দিল।

> ''থানার পুলিশ চোখ রাঙিয়ে নারকেলের কাদি ভেঙে তরমুজের খেত তছনছ করে, চিনেবাদাম ক্ষেত মাড়িয়ে দখল নিতে লাগল। জমি যখন সরকারের, তখন জমির ফসলে তো সরকারী লোকের অধিকার। গ্রামের মানুষ লাঠি সোঠা নিয়ে তাড়া করল সার্ভেয়ার দল আর পুলিশকে। পুলিশ সাময়িক পালালেও, রাত্তিরে সেজে গুজে এল গ্রামে। বন্দুক উঁচিয়ে ঘরে ঘরে টর্চ মারতে লাগল। পছন্দ মতো

মেয়েমানুষ খুঁজতে লাগল। - পুলিশ জানত, পুরুষগুলো ভয় পেতে পারে তাদের ঘরের মেয়েদের বে-আব্রু করে দিল। কিন্তু বেয়াব্রু সত্যিই পুলিশ করেছিল কিনা মেয়েদের, ধর্ষণ করেছিল কিনা পুলিশ এবং কাঁটাতার বসানোর ঠিকেদারের মাস্তান বাহিনী সে কথা বলার মতো কেউ ছিল না। কোন মেয়ে তার লাঞ্ছনার কথা বলে? বলে না, বলতে পারে না বলেই ধর্ষণ, লাঞ্ছনাই পুলিশের হাতের সবচেয়ে বড়ো অস্ত্র।" (পৃঃ ১০৪ / অশ্বচরিত)

মেয়েদের তো বলাই হয় 'বুক ফাটে তবু মুখ ফোটে না' আর তার উপর ধর্ষিতা মেয়েদের সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা নেই বলেই মেয়েরা লাঞ্ছনা সহ্য করে যায়। তবু সুভদ্রার মতো দু-একজন মুখ খোলে। কিন্তু যেখানে দুষ্কৃতিকারীরা স্বয়ং পুলিশের লোক বা তাদের মদতপুষ্ট তখন বিচার কোথায়? মানবাধিকার সমিতির প্রচেষ্টার পরেও অর্থের হাতে বিকিয়ে যাওয়া স্বামীর অসহযোগিতা এবং ষড়যন্ত্রে দোষী তো শাস্তি পেলই না, উপরন্তু এবার দফায় দফায় চলে তার উপর ধর্ষণ।

"-শেষবার পুলুশে, থানায়। - পুলুশ কহিছিলা, যদি ফের শোরগোল তুলে সুভ্দ্রা, আবার উহাকে নষ্ট করিবে উহারা, তখন সুভ্দ্রা চুপ করি রহিলা।" (পৃঃ ১১৬ / অশ্বচরিত)

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় যেখানে জনগণের দ্বারা, জনগণের জন্য, জনগণের সরকার, যেখানে সরকারি কাজের জন্য গৃহহীন হয় কত মানুষ, ধর্ষিত হয় কত নারী --- তার হিসেব কে রাখে? কখনো সামরিক প্রয়োজনে, কখনো বড়ো কারখানা খোলার জন্যে, তো কখনো নদী বাঁধ তৈরির নামে দেশের বিভিন্ন স্থানে সরকার জমি অধিগ্রহণ করে আর তার নেপথ্যের কাহিনি, অস্বীকার করার উপায় নেই যে, কমবেশি এই-ই। যে কোনো প্রতিবাদী কণ্ঠকে চুপ করানোর জন্যে পুলিশের সাধারণ উপায় হল, নারী হলে ধর্ষণ আর পুরুষ হলে বেধড়ক মার। প্রায়সময়ই রক্ষক ভক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। অমর মিত্র এই বিষয়টিকে আরো বিস্তৃত করেছেন ২০০১ সালে প্রকাশিত 'নিরুদ্দিষ্টের উপাখ্যান' উপন্যাসে। পুলিশি অত্যাচারের কালো অধ্যায় ছাড়াও দেপাল, বালিমুণ্ডার জমি অধিগ্রহণের কাহিনিতে আরো একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, যে দেশের অর্ধেক-এর চেয়েও বেশি মানুষ অপুষ্টিতে ভোগে, এক বৃহৎ সংখ্যক লোক দুবেলা পেট পুরে খেতে পায় না সেখানে জমির ফসল দুপায়ে মাড়িয়ে তছনছ করে দেওয়া হয় সামরিক অস্ত্রশস্ত্র পরীক্ষা নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে।

এই আখ্যানে রাষ্ট্রীয় আধিপত্যবাদী প্রতাপের বিরুদ্ধে এক সোচ্চার প্রতিবাদ নিঃসন্দেহে। উন্নয়নের নামে প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করা অথবা মানুষের আর্থিক ভারসাম্য নষ্ট করার বিরুদ্ধে কথাশিল্পী অমর মিত্রের সোচ্চার প্রতিবাদ 'অশ্বচরিত'। পরমাণু বোমার মতো বিধ্বংসী অস্ত্র নিয়ে ছেলেখেলার বিপক্ষে যেমন শৈল্পিক প্রতিবাদ তেমনি রাষ্ট্রের ফ্যাসিবাদী চরিত্রের বিরুদ্ধে কথা বলে এ আখ্যান। সতীশ গিরির মতো চরিত্রের মাধ্যমে অমর মিত্র রাজনৈতিক সময়ের একটা চিত্র ফুটিয়ে তোলেন, যখন ক্ষমতাসীন দলের উস্কানিতে দক্ষিণপন্থী উগ্র জাতীয়তাবাদ যুবসমাজকে গ্রাস করছে। ছড়িয়ে পড়ছে সাম্প্রদায়িকতার বিষ। প্রাচীন ইতিহাসকে অস্বীকার করে যে ক্ষমতাসীন দল নিজস্ব নির্মিত ইতিহাস ছড়িয়ে দিচ্ছিল সবার মধ্যে তারই যেন প্রতিনিধি সতীশ। কিন্নর রায় 'বালিঘড়ি' নামক উপন্যাসটিতে দেখিয়েছেন কীভাবে একটু একটু করে বদলে দেওয়া হচ্ছে সত্য ইতিহাস। কাশী বারাণসী হিন্দুদের তীর্থস্থান। তাকে গড়ে তোলার মুসলমান নবাবদের অবদান মৌলবাদীদের হজম হয়না, তাই ইতিহাস বদলে দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয় আসলেও তো তাই হচ্ছিল। স্কুলের ইতিহাসের বই বদলে যাচ্ছিল। বিবেকবান বুদ্ধিজীবিরা কি তা দেখে এবং বুঝেও অন্ধ সেজে বসে থাকতে পারেন! তাঁরা তো জানেন অন্ধ হলেও প্রলয় বন্ধ হয় না। তাই তাঁরা তাঁদের সাহিত্যকৃতির মাধ্যমে চেষ্টা করেন

জনসাধারণের সুপ্ত বোধ জাগ্রত করতে। স্থিতধী নগেন গিরির ছেলে অর্ধোন্মাদ সতীশ গিরি সংক্রামিত হয় সাম্প্রদায়িকরাত বিষে। সে তার পিতাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্যে হত্যা করে নির্দোষ ঘুড়ীকে, যেটির গর্ভে কন্থক জন্ম দিয়েছিল সন্তান। সে বিশ্বাস করে, যুদ্ধ না হলে উপায় নেই, মানুষের মরা দরকার, মরণ চাই। সে বদলে দিতে চায় ইতিহাস। সে কন্থক আর নগেন গিরির ঘুড়ির সন্তান ঘোটনের পূর্বপুরুষের দেহে কোন দেশের ঘোড়ার রক্ত খোঁজে না, সে বলে কোনো রূপকথার পক্ষীরাজের উত্তরপুরুষ ঘোটন। সে কন্থকের হারিয়ে যাওয়ার ব্যাখ্যা দেয় তার মতো করে। অর্ধোন্মাদ সতীশ বলে -----

> "... হা ভগবান, সিই ঘুড়ারে তুমি খুঁজি বেড়াচ্ছ, তুমি ধরতি পারনি, সি ঘুড়া কুথায় গেল, ইতো পাস্কার ঘটনা, তুমার অশ্বের ডানা ফুটি গিইছে।" (পৃঃ ২৮৮ / অশ্বচরিত)

ঘোড়ার হত্যা যে কেবল একটি প্রাণীর নিধন নয়, তা কথাকার বারবার ইঙ্গিত করেছেন। সতীশ গিরি একবার বলেছে 'ইটা প্রতীকী'। আর তার পিতা নগেন গিরি কেবল বর্তমান নয়, অতীতের ছায়া দেখেন এসব ঘটনার মধ্যে। তিনি বলেন ----

> "... ইতিহাস যদি জানতে তুমি, টের পেতে কী হইছিলা একদিন এতো ঘুড়ী মরিছে, দাঙ্গায় মানুষ কি কম মরিছে, আবার মানুষ মারার ইঙ্গিত ছিলা ঘুড়ীটির মরণ, কতখানি রোষ কতখানি হিংসা মাথার ভিতর ঢুকি গিইছে কহো দেখি, দিনাদিনা তা আরো বাড়বে ভানুবাবু, যত অভাব তত হিংসা, অভাবী মানুষের ভিতর হিংসা জাগানোর খেলা চলিছে।" (পৃঃ ২৯২)

কিন্তু নগর পুড়লে তো দেবালয় রক্ষা পায় না। হিংসা, সাম্প্রদায়িকতার বিষ যার ছড়িয়ে দিচ্ছে চারিদিকে, তারা যে সেই বিষ থেকে রক্ষা পাবে তাও তো হয়। অমর মিত্র যেন এই সহজ কথাটাই আবার আমাদের মনে করিয়ে দিতে চান সতীশের অসুস্থতার মাধ্যমে -----

> "... শালা মোরা কী কাণ্ড করছি জাননি, বোমা ফাটল হিলা, আরো কত কী হবে, দেহ চর্চা হচ্ছে, ঘুড়ীটারে মারা হিলা, আগে অযোদ্ধ্যা কিণ্ড হিলা ...। বলতে বলতে পেট চেপে বসে পড়ে সতীশ গিরি। গ্যাসের ব্যথা, এক ঘটি পানি লিয়ে এস ভানুবাবু। দুটি চোখ স্ফীত হয়ে বেরিয়ে পড়েছে প্রায়। জিভ বেরিয়ে পড়েছে সতীশের।" (পৃঃ ২৯৫/ অশ্বচরিত)

আর এও তো সত্য, পাঁচজন দাঙ্গাবাজ হলে পাঁচশ জন থাকে দাঙ্গাবিরোধী, অশুভ বুদ্ধিসম্পন্ন লোকের বিপরীতে চিরকাল থেকে যায় কিছু শুভ বুদ্ধিসম্পন্ন লোক, তাই তো পৃথিবী আজও বাসযোগ্য। তাই সতীশের মতো যারা পরমাণূ বোমার বিস্ফোরণের ফলে কন্থকের ডানা বেরিয়ে সে উড়ে গেছে-ধরণের সুবিধাবাদী গল্প বোনে, মানুষকে ভুল পথে চালিত করে তাদের বিপরীতে কোকিলা জানাতে চায় আসল কাহিনিটা তার দৃষ্টির মাধ্যমে। কোকিলা শিল্পী। সে প্রথমে যে ঘোড়ার ছবি মদরঞ্জিতে এঁকেছিল তা দেখে ভানুর মনে হয়েছিল এই তার কন্থক। কিন্তু সেটি বিক্রি হয়ে যায় কলকাতায়। ভানুর অনুরোধে সে আবার আঁকতে বসে। কিন্তু যে ঘোড়ার ছবি প্রথমে সে এঁকেছিল সহজেই, তা এবার আর হতে চায় না। সে শুনে পোখরানের কথা, হিরোসিমা নাগাসাকির কথা। সে জানতে পারে পোখরানে পরমাণু বোমা ফাটিয়ে চতুর্দিকে যে তেজস্ক্রিয় বিষবাষ্প ছড়িয়ে দেওয়া হল, তা দেশে শক্তি বৃদ্ধির জন্য। কিন্তু সে বুঝতে পারে না দেশ যদি মানুষ নিয়ে হয়, তাহলে পেটে ভাত না থাকলে কী করে শক্তি বাড়ে। অবশেষে সে আঁকে। এবার আর আশ্বিনের নীল আকাশের চালচিত্রে কেশর ফোলানো শাদা ঘোড়া নয়, এবার পৃথিবীর বুক ফেটে কালো ধোঁইয়া উঠে যাচ্ছে আকাশ পর্যন্ত আর ঘোড়া তা থেকে বাঁচার চেষ্টায় পালাচ্ছে। ঘোড়াটার চোখ বিস্ফোরিত, নাসারন্ধ্র ফুলে উঠেছে, কেশরপুঞ্জ ঘাড়ের উপর দাঁড়িয়ে গেছে। কথা ছিল শ্রীপতি এই মগরঞ্জিটি কিনে নেবে, কিন্তু সে তো নিলই না, উপরন্তু সে

জানতে চাইল এমনটা কেন। আধিপত্যবাদের পৃষ্টপোষক শ্রীপতির মতে এমনটা আঁকা ঠিক হয়নি। কিন্তু কোকিলা জানে এটাই সত্য, জানে সুভদ্রাও আর কেবল জানা নয়, এ তো তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। রূঢ় সত্য যখন তার নখদন্ত নিয়ে প্রকাশিত হল তখন শ্রীপতি ভয় পেয়ে যায়। মায়ার চাদর যেন সরে যেতে থাকে, কোকিলার প্রতি মোহ আর থাকে না। সুভদ্রাকে সে যে ক্ষমতায় রামচন্দ্রের সঙ্গে যেতে না দিয়ে নিজের মুঠোয় রেখেছিল সেই ক্ষমতাও হঠাৎ করে যেন সে খুঁজে পায় না। সে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধাচার করার ক্ষমতা রাখে না, এ সত্য বলার বা জানানোর সাহস সে করে না। কিন্তু কোকিলা সে সাহস রাখে। সে বলে -----

> "..... এটি লিয়ে তুমার গৌরদাদা হাটে হাটে ঘুরবে, না বিকোক, লক কেন পলাইছিল পংখিরাজ।" (পৃঃ ৩২৭-৩২৮ / অশ্বচরিত)

আর সুভদ্রা সাহস পায় 'মদরঞ্জির উপর আঁকা দেখে' অথবা কোকিলের দেখে। রামচন্দ্র পারেনি শ্রীপতির বিরুদ্ধাচরণ করার কিন্তু এবার সুভদ্রা করে। সে চলে যায় রাতের অন্ধকারে শ্রীপতির হোটেল ছেড়ে। এভাবে ঘোষিত হয় আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। কোকিলা পরোয়া করে না দক্ষিণপন্থী উগ্র জাতীয়তাবাদের নেশায় উন্মাদ মানুষদের। সে স্বেচ্ছায় কাঁধে তুলে নেয় সত্য কথনের দায়িত্ব। সুভদ্রা পুরুষতন্ত্র আর পুলিশি অত্যাচারের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হতে হতেও ঘুরে দাঁড়াতে চায় বারবার। শেষ পর্যন্ত সে ভালোবাসার বন্ধন থেকে ছাড়া আর কোনো বাঁধনে বাঁধা থাকতে চায়নি। তাই সে বেরিয়ে যায় অজানার উদ্দেশ্যে।

মরণ ছড়িয়ে পড়ছে চতুর্দিকে। বাতাস ভাসছে মরণের গন্ধ। তাই বলে জীবন কি থেমে থাকতে পারে! তাই কুন্তি বিক্রি হয়ে যাওয়ার পরও তার বাবা মা আবার স্বপ্ন দেখে, আবার সন্তানের আগমন সংবাদে শিহরিত হয়, সংসার সাজায়। দুঃসময়ে বসে সময়ের যথার্থ স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেও মানুষকে নিরাশার ঘোরে নিমজ্জিত না করে কথাকার দেখান আশার আলো। তিনি তাঁর এ উপন্যাসে বিশ্বব্যাপ্ত উন্নায়ন, সমুদ্রের তেল গাদ, পরমাণুর তেজস্ক্রিয়তার কথা বলেন, বলেন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কথাও, কিন্তু আশার কিরণ রয়ে যায়।

আখ্যানের আপাত উপসংহারে এসে সব মানুষকে সরিয়ে দিয়ে মনুষ্যেতর অশ্বই হয়ে উঠেছে প্রধান আকল্প। এবার কন্থকের কাহিনি পেলাম কন্থকেরই জবানিতে। বৈশাখের প্রচণ্ড রোদের পর এক পশলা বৃষ্টি আর পূর্ণিমার জ্যোৎস্না-স্নাত আকাশ তার মনে বিভ্রম জাগিয়েছিল। একই দিনে দুই ঋতু পেরিয়ে যাওয়ার বিভ্রম তাকে ঘোড়া ছিল না। ভুল বুঝতে পেরে সে ফেরে দীঘার পথে। কিন্তু পথ ভুল হল এবার। জনপদে পৌঁছে সে নিশ্চিন্ত হয়েছিল, এবার কোনো না কোনোভাবে পৌঁছে যাবে গন্তব্যে। কিন্তু তার পেছনে জুটল কিছু যুদ্ধবাজ মানুষ। যাদের চোখে সে অশ্বমেধের ঘোড়া অথবা যবনের ঘোড়া। তবে যাই হোক না বধ্য এবং যুদ্ধের অজুহাত। তাদের হাত থেকে বাঁচার জন্যে সে ছুটতে থাকে। ছুটতে ছুটতে সে হয়তো বা পৌঁছে যায় মরুভূমিতে --- পোখরানে। সে অন্ধ হয়ে যায়, তার গায়ের রোম খসে পড়তে থাকে, কেশর-পুচ্ছ ঝরে যেতে থাকে। রক্ত বেরোতে থাকে নাক মুখ দিয়ে। অন্ধ দুচোখ দিয়ে ঝরে পড়তে থাকে জল। আখ্যানের এই সমাপ্তি অংশটুকু সম্বন্ধে তাত্ত্বিক সমালোচক তপোধীর ভট্টাচার্য লেখেন ---

> "উপন্যাসে সমাপ্তি বিহীন উপসংহারে অন্ধ ঘোড়া যেন হয়ে ওঠে কেন্দ্রীয় কুশীলব। মহাসময় ও খণ্ড-সময়ের ব্যবধান মুছে যাওয়াতে ভাষায় ছড়িয়ে পড়ে পরাবাচনের দ্যুতি। বৈদিক যুগ এবং হিরোশিমা-পোখরানের অগ্নিবলয় মিলে মিশে এককার হয়ে যায়। বয়ানের শেষ পাঁচটি পৃষ্ঠা যেন উপন্যাস নামক শিল্প মাধ্যমের সম্পূর্ণ বিনির্মাণের দৃষ্টান্ত। আমাদের ঘুমন্ত বিবেককে পর্যন্ত জাগিয়ে দেয় অশ্বচরিত-এর কেন্দ্রীয় আধেয়, তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে উপন্যাসের মানুষেরা সরে যায় পেছনে। যেন বয়ন শিল্পের পরিসর

মঞ্চে রূপান্তরিত এবং পাদপ্রদীপের সমস্ত আলো কেন্দ্রীভূত হয়েছে ভূগোল ও ইতিহাসের বিভিন্ন পরিসরে উপস্থিত কন্থকের উপর। আত্মবিস্মৃত সময়ের দাহ তার গায়ের চামড়াকে ঝলসে দেয়। কালো বৃষ্টি ঝরে পড়ে সেই কালো মেঘ থেকে যা "এখনো মাথার ভেতরে বহন করে চলেছে মানুষ, হিরোশিমার মানুষ" (পৃঃ ৩৪১)। তার অন্ধ চোখের জল ছাড়া অন্য কোথাও জল ছিল না। আত্মবিস্মৃতির অন্ধকার সমস্ত কিছুকে কালো করে দিলেও অমর এই আশ্চর্য অনবদ্য মুক্ত উপসংহারে পৌঁছেছেন যে অন্ধ ঘোড়া তবু জ্যোৎস্না, আশ্বিন ও কাশফুলের কথা ভাবে।" (পৃঃ ১৪১ / আখ্যানের স্বরান্তর)

সে অন্ধ হয়ে গেছে তবু তার চলা বন্ধ হয়নি। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে তার চলা তেজস্ক্রিয় বিষবাষ্পে ভরা এই সময় হয়ে ভবিষ্যতের দিকে। জেগে থাকে উত্তরণের আকাঙ্খা। আর্থ-রাজনৈতিক শোষণ, সানাজিক নানা সংকট, রাষ্ট্রের ফ্যাসিবাদী চরিত্র বিভিন্নভাবে মানুষের জীবনে তৈরি করছে সংকট। মৃত্যু-হিংসা-শোকে ভরা এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকাও এক সমস্যা। কিন্তু তা সত্বেও কী মায়া এই পৃথিবীতে। জন্ম জন্মান্তরে মানুষ ফিরে আসতে চায় এই ধরিত্রীর বুকেই। আর সেজন্যেই বোধ হয় সমস্ত সন্দেহ, অবিশ্বাস, আত্মহননের তেজস্ক্রিয় পেরিয়েও অন্ধ ঘোড়ার অনুভব থেকে জেগে ওঠা আলো ---

"শুধু তার মাথার ভিতরে বুদ্ধদেবের মতো প্রেমময় চাঁদ ছিল। আলো ছিল, চাঁদ আর আলোর স্মৃতি ছিল। সমুদ্র ছিল, বাতাস ছিল, সবুজ তৃণভুমি ছিল। ছিল সেই রাজপুত্র যার মাথায় মাথায় চলত সোনালি রঙের মেঘ, শ্বেত কবুতর উড়ত যে মেঘে, সেই মেঘের দিনগুলি স্মৃতিতে আছে।" (পৃঃ ৩৪২ / অশ্বচরিত)

জীবনের অনতিক্রম্য ভবিষ্যৎ মৃত্যু। জীবনের ভিতরেও মৃত্যু, সুতরাং মৃত্যুর ভিতরেও মৃত্যুই। প্রকৃতি যেমন মৃত্যুর ফাঁদ তৈরি করে, মানুষ তেমনি অন্যের জন্যে মরণ ফাঁদ তৈরী করতে গিয়ে নিজের জন্যেই বানায় বিনাশক অস্ত্র। বিশ্বযুদ্ধ ও হিরোশিমা-নাগাসাকির হিংস্রতা দেখে জীবনানন্দ দাশ লিখেছিলেন ----

"দুশ্চর সমুদ্র ঘিরে বধির বদ্বীপ — ইতস্ততঃ —
নিস্পৃহ ভূখণ্ড নিয়ে
এক-এক জন
আজ এই পৃথিবীর
স্তূপীকৃত-অন্ধ-নির্বান্ধব
লোহার শকট ভরা আবিষ্ট মানব।"
(পৃঃ ৫১৩/ কাব্য সংগ্রহ)

এখন চোখের সামনে ঘটে চলেছে ইরাক-বসনিয়া-চেচেনিয়া-অযোধ্যা-কারগিল আর আমরা এ সব কিছু দেখেও প্রত্যেকে বাস করছি বোকা বাক্স, বিশ্বজাল আর প্রযুক্তি সমৃদ্ধ নিজস্ব নিস্পৃহ ভূখণ্ডে। তাই দেখি শ্রীপতি নিজের ঘরের অন্ধকার কোণায় সুরক্ষা খোঁজে, অথবা দেখে-শুনে বুঝেও না দেখা, না শোনা আর না বোঝার ভান করে। কিন্তু সবাই তো শ্রীপতির মতো অন্ধ হয়ে প্রলয় বন্ধ করার বোকামিতে বিশ্বাসী নয়। কিছু কিছু মানুষ তো জানে অপারেশন টেবিলে শায়িত রোগীর মতো ধীরে ধীরে মহাসুষুপ্তির দোরগোড়ায় পৌঁছানোর চেয়ে -----

"…. better to feel ourselves dying, even in the convulsions of terrorism, than to disappear like ectoplasms which no one, even desensitized, will want to conjure up later to give themselves a fright." (Coll Memories / Page – 4)

তাই তো দেখি ক্ষয়ে শেষ হয়ে যাওয়ার চেয়ে সংগ্রামকেই বেছে নিয়েছে সুভদ্রা, কোকিলা। তাই তো মৃত্যুর মাঝে দাঁড়িয়েও স্বপ্ন দেখে আলোর আর মরে যেতে যেতেও চেষ্টা করে উঠে দাঁড়ানোর। আর তাই তো কবি বলেন, "মানুষের মৃত্যু হলে তবুও মানব থেকে যায়" (পৃঃ ১২১ / জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা) অথবা ----

"পৃথিবীর পুরনো সে পথ
মুছে ফেলে রেখা তার ---
কিন্তু এই স্বপ্নের জগৎ
চিরদিন রয় !
সময়ের হাত এসে মুছে ফেলে আর সব ---
নক্ষত্রেরা আলো শেষ হয়!"
(পৃঃ ৪১ / স্বপ্নের হাত / শ্রেষ্ঠ কবিতা)

সহায়ক গ্রন্থ ও পত্রিকা:

১. অশ্বচরিত / অমর মিত্র / করুণা প্রকাশনী / কলকাতা -০৯ / ১৯৯১ ।
২. আখ্যানের স্বরান্তর / তপোধীর ভট্টাচার্য / দিবারাত্রির কাব্য / ২০০৭ ।
৩. অমৃতলোক (৯৭) অমর মিত্র বিশেষ সংখ্যা / মার্চ ২০০৩ / সমীরণ মজুমদার সম্পাদিত ।
৪. কোরক সাহিত্য পত্রিকা, প্রাক শারদ সংখ্যা ১৪১৫ / তাপস ভৌমিক সম্পাদিত ।
৫. সুন্দর, বৈশাখ ১৪০৭ ।
৬. তুলি থেকে বেয়নেট / মদনমোহন গুহ / ভারতী বুকষ্টল / কলকাতা — ০৯ ।
৭. Coll Memories / Jean Baudrillard / New York / Verso / 1994.
৮. জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা / জীবনানন্দ দাশ / ভারবি / কলকাতা -৭৩ / নবম মুদ্রণ -২০০১ ।
৯. কাব্য সংগ্রহ / জীবনানন্দ দাশ ।